দৈনিক সংবাদ

052

05 JUL 1986

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

প্রাথমিক শিক্ষার সংকট

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ত্যাগের হার আগের চেয়ে বেড়ে গেছে। এর হার এখন ৮৬ শতাংশ। যেসব ছাত্র-ছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হচ্ছে তার শতকরা মাত্র চৌদ্দভাগ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত টিকে থাকছে। অন্যরা এর আগেই, বেশীরভাগ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। সম্প্রতি এক জরিপে এ তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। এই সাথে সেদিন প্রকাশিত এক খবরে উল্লিখিত হয়েছে যে, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের আগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কাজ স্থগিত রেখে বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের সরকারী অনুদান দেয়ার চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাধীনে দেশের বর্তমান সাড়ে সাত হাজার বেসরকারী স্কুলের মধ্যে এক হাজার স্কুলকে সরকারীকরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এ দু'টি বিচ্ছিন্ন কোন সমস্যা নয়। দেশে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির যোগ্য ছেলে-মেয়ের সংখ্যা হচ্ছে বর্তমানে দেড় কোটি। এর মধ্যে ৯০ লাখ স্কুলে ভর্তি হচ্ছে। বাকী ৬০ লাখ স্কুলের চৌকাঠ কখনোই মাড়ায়নি। জনসংখ্যার বিরাট অংশ এভাবে গোড়াতেই রয়ে যাচ্ছে নিরক্ষর। এর ওপরে যারা স্কুলে ভর্তি হচ্ছে তাদের ৮৬ শতাংশ মাঝখানে স্কুল ছেড়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত নিরক্ষরের দলে গিয়ে ভিড়ছে। এত দিনে অবস্থার উন্নতি কিছুই হয়নি, হয়েছে বরং অবনতি। এক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যা যথেষ্ট রয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রয়াসের ক্ষেত্রে ব্যাপক ত্রুটি ও আন্তরিকতাহীন আনুষ্ঠানিকতার কারণে যে সমস্যা বাড়ছে সেজন্য আক্ষেপ বেশী করে হয়।

শিক্ষাকে শিশু ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে আকর্ষণীয় করে তুলতে না পারার ব্যর্থতার পেছনে অর্থের সংকট যেমন দায়ী, তেমনি রয়েছে নানা অব্যবস্থা। শিক্ষার বিস্তার, নিরক্ষরতা দূরীকরণের নাম করে প্রচারের বন্যা বইছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা যে কি দাঁড়িয়েছে সেটা গ্রামে না গেলে বোঝার উপায় নেই। গ্রামের এক একটি জরাজীর্ণ প্রাইমারী স্কুল ভবন এর নীরব সাক্ষী হয়ে আছে। বহু স্কুলভবন দীর্ঘকাল ধরে সংস্কারহীন অবস্থায় পড়ে আছে। টুল-টেবিল ও শিক্ষাদানের বিভিন্ন সরঞ্জামের অভাব সাধারণভাবেই রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যার শতকরা ৩৮ ভাগেরই বসার জায়গা নেই। এ অবস্থার ভেতরে চলছে পড়া-শোনার কাজ। কোন ছাত্র স্কুলে গিয়ে বসার জায়গাই যদি না পায় তবে তার মনে পড়াশোনার আগ্রহ আর ক'দিন থাকবে?

শিক্ষকের অভাবও এক বড় সমস্যা। আমাদের দেশে প্রতি ৪৩ জন প্রাথমিক ছাত্রের জন্যে একজন শিক্ষক রয়েছেন। প্রতিবেশী দেশগুলোতে এর হার অনেক বেশী। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষকের বহু পদশূন্য পড়ে আছে। পড়াশোনায় ছাত্রদের আগ্রহী করে তুলতে শিক্ষকদেরও রয়েছে যথেষ্ট দায়িত্ব। এক্ষেত্রে অন্যান্য সমস্যার সাথে শিক্ষকদের মধ্যে আগ্রহ ও দায়িত্ববোধের অভাব, উপযুক্ত মটিভেশন, জবাবদিহির ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণের অভাব বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করছে। এসব সমস্যার দরুন শিক্ষা প্রসারে বাঞ্ছিত অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব হচ্ছে না। দেশের উন্নয়নে এটা বিরাট বাধার সৃষ্টি করে রেখেছে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার এক মূল্যায়ন রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে যে, এর প্রান্তিক বছরে ১ কোটি ৩০ লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাদানের যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল সেক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে মাত্র ৮৯ লাখ ২০ হাজার।

বাস্তব এ সমস্যাগুলো দূর করার যথাযথ ব্যবস্থা না করে শিশু ছাত্র-ছাত্রীদেরকে লেখাপড়ায় যেমন ধরে রাখা যাবে না, তেমনি শিক্ষা প্রসারে বিশেষ কোন অগ্রগতিও আশা করা যায় না। অর্থাভাব যে এক্ষেত্রে প্রধান বাধা তার উল্লেখ নতুন করে নিষ্প্রয়োজন। শিক্ষাখাত আমাদের দেশে যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে না এ খাতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণই তার প্রমাণ। প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় আমাদের দেশে শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ অনেক কম। শিক্ষাখাতে জাতীয় বাজেটের ১১ শতাংশের বেশী বরাদ্দ হচ্ছে ভারতে, পাকিস্তানে ১০ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ১৮ শতাংশ। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বরাদ্দের পরিমাণ হলো মোট বাজেটের মাত্র ৪ শতাংশ।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাধীনে শিক্ষাখাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ছিল পরের দিকে তার এক-তৃতীয়াংশ ছাঁটাই করা হয়। শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ খাতের জন্য যেখানটায় প্রয়োজন বর্ধিত ব্যয়ের সেক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত ব্যয় ছাঁটাই কি করে কাম্য হতে পারে?

বেসরকারী স্কুল সরকারীকরণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থতার জন্যও অর্থসংকটই দায়ী। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে ২ হাজার বেসরকারী স্কুল সরকারীকরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল; কিন্তু হয়েছে মাত্র ১১০টি। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে এ কর্মসূচী বাদ দেয়ার চিন্তা হচ্ছে। শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এর ফল কখনো শুভ হতে পারে না। সরকারী স্কুলগুলোর অবস্থাও যে ভাল এমন নয়। তবু সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার পর শিক্ষার প্রতি যে বর্ধিত গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বদলে উল্টো দিকে যাত্রার উদ্যোগ কেন সে প্রশ্ন কর্তৃপক্ষের কাছে অবশ্যই রাখতে হয়।

আমাদের দেশে টাকার অপচয় নানাভাবেই হচ্ছে; কিন্তু শিক্ষার প্রসারের জন্য টাকা ব্যয়ে এত কার্পণ্য কেন? জাতীয় উন্নয়নে এর অগ্রাধিকার সঠিকভাবে উপলব্ধি করে অর্থের বরাদ্দ সে অনুপাতেই বাড়াতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার উপযুক্ত ঠাঁই যেমন চাই, তেমনি তাদের হাতে সময়মত তুলে দিতে হবে বই, শিক্ষকের সংখ্যা বাড়িয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বাড়িয়ে তুলতে হবে। তবে প্রয়োজনের একটি দিক মিটবে। এর সাথে সাথে বিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপনা উন্নত ও পরিদর্শন পদ্ধতি জোরদার করে শিক্ষকদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেয়ার ব্যবস্থাও থাকতে হবে।

শিক্ষার অনগ্রসরতার জন্য আমাদের দেশের সার্বিক দারিদ্র্য অনেকখানি দায়ী। দরিদ্র যে লোকটি তার সন্তানের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দিতে পারে না শিক্ষা নিয়ে ভাবনার অবকাশ তার কতটুকু রয়েছে? শিশু সন্তানদেরকে সে চাইবে তার জীবিকায় সহায়ক হিসেবে পেতে। গ্রামের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের জন্যই এটা বড় সমস্যা। তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলতেও লেখাপড়ার মধ্যে ধরে রাখতে এ ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো রয়েছে তা দূর করতে হবে। সাথে সাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষা ছাড়া সমাজকে দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতা থেকে মুক্ত করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কা এর বড় উদাহরণ।